ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটির বৈঠকে আলোচনার প্রেক্ষিতে **মুহাম্মদ নওশাদ জমির** - এর (সংসদ সদস্য ১, পঞ্চগড়-১) গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫ সম্পর্কিত লিখিত বক্তব্য।

বক্তব্য: গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫ উত্থাপিত আপত্তির জবাবে

সম্মানিত সভাপতি, কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

১। গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ ২০২৫ নিয়ে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মন্তব্যে যে আপত্তিগুলো উঠেছে, সেগুলোর জবাব দেওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। উত্থাপিত আপত্তিগুলোর কিছু যুক্তিসংগত, কিছু নয়। আমি সেই পার্থক্যটা তুলে ধরব। কমিটিকে আমি আমার মতামতগুলো অনুগ্রহ করে বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

যে আপত্তিগুলোর সঙ্গে আমি একমত

প্রথমে যে দুটি আপত্তিতে আমার কোনো দ্বিমত নেই, সেখান থেকে শুরু করি।

২। **প্রথমটি ধারা ৪** এবং সাজার পরিমাণ নিয়ে। আপত্তিটি হলো, শাস্তির বিধানটিকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এই সংশোধন হওয়া উচিত।

৩। **দ্বিতীয়টি ধারা ১৩(৬)** এবং পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগে সুপারিশের বিষয়ে। সরকার যদি কমিশনের এই পরামর্শদানের ভূমিকা তুলে নিতে চায়, তাহলে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

এই দুটি পরিবর্তন সহজ। আইন পাসের আগে দুটি সংশোধনই গ্রহণ করা যেতে পারে।

যে আপত্তিগুলোর সঙ্গে আমি একমত নই

৪। এবার তিনটি আপত্তির দিকে আসি। কারণ এই আইন আদৌও কার্যকর হবে কি না, সেটা এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে।

প্রথমত: ধারা ১৩(৯)- তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি

৫। আপত্তিটি বলছে, কোনো সরকারি কর্মচারী বা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। কমিটিকে একটি সরাসরি প্রশ্ন করতে চাই। **গত পনেরো বছরে গুমের শিকার পরিবারগুলো যখন সরকারের কাছে অভিযোগ করেছিল, কী হয়েছিল?** এই কমিটি উত্তরটা

জানেন। A watchdog that must ask the permission of the institution it is watching before it can investigate is not a watchdog. It is a shield for that institution.

৬। তবে আরও একটি যুক্তি দিতে চাই। সরকার সবসময় তার নামে যা করা হচ্ছে তার প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত জানে না। রাজনৈতিক পর্যায়ে নীতির সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে পদ্ধতি নির্ধারিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, অনানুষ্ঠানিক কমান্ড কালচার এবং মধ্যবর্তী কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তে। এটি সমালোচনা নয়, এটি বড় প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা।

৭। একটি কার্যকর তদারকি সংস্থা সরকারকে রক্ষা করে। এমন সংস্থা নির্ধারণ করে দেয় কোথায় বৈধ রাষ্ট্রীয় নীতি শেষ হয় এবং কোথায় বেআইনি কার্যক্রম শুরু হয়। সরকার যদি প্রতিটি তদন্তের আগে অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে পরবর্তীতে যা আবিষ্কৃত হয় তার দায়ও সরকারের ঘাড়ে পড়ে। উল্টোদিকে, স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারা একটি সংস্থা সরকারকে রক্ষা করে কারণ এটি প্রমাণ করতে পারে যে অনুমোদিত নীতি আর মাঠে যা ঘটেছে, দুটো এক নয়। **তদন্তের আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া সরকারের জন্য সুরক্ষা নয়। এটি দায়ের বোঝা।**

দ্বিতীয়ত: ধারা ৬- জাতীয় নিরাপত্তায় আটকের ক্ষেত্রে ছাড়

৮। আমাদের সামনে আপত্তিটি বলছে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে আটক করা হলে সেটি এই আইনের আওতায় গুম হিসেবে বিবেচিত হবে না- এমন বিধান যুক্ত করতে হবে।

৯। প্রথমে একটি বিষয় স্পষ্ট করি। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য নিবর্তনমূলক আটক বন্ধ করা নয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের যে নিবর্তনমূলক আটকের অধিকার রয়েছে, এই অধ্যাদেশ সেই অধিকারকে সীমিত বা পরিবর্তন করেনি। সেই প্রশ্ন এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

১০। অধ্যাদেশে গুমের সংজ্ঞা মূলত সংবিধানের বিদ্যমান বাধ্যবাধকতাই প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩(২) অনুযায়ী, গ্রেফতার বা আটক করা হলে ২৪ ঘণ্টা ও যাতায়াত সময়ের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। অধ্যাদেশ এই বিধান নতুনভাবে তৈরি করেনি, কেবল অনুসরণ করেছে। সরকার চাইলে জাতীয় নিরাপত্তার মামলায় বিশেষ বিচারিক সংস্থার কাছে হাজির করার ব্যবস্থা রাখতে পারে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনো বিচারিক কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করার বাধ্যবাধকতা সংবিধানে সুনির্দিষ্ট।

এই আপত্তি মেনে নিলে কমিটি এমন একটি বিধান সুপারিশ করবে যা সংবিধানের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক, এবং সেই পরিবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধন ছাড়া কোনো পথ নেই।

১১। ২৪ ঘন্টার এই নিয়মের বাইরে আমাদের যাওয়াও উচিত হবে না। দরকার হলে produce করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে ছয় মাস নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে আটক রাখুন। তবে produce না করলে বাহিনীগুলো free chit পেয়ে যায়। সরকারের অনুমোদনের বাইরেও একজনকে মেরে ফেলা খুব সহজ হয়ে যায়। গত ১৫ বছরে আমরা এটা দেখেছি। The fate of a man should not depend on the whims of a random officer.

তৃতীয়ত: ধারা ৪(৬) ও ৪(৭) - সুপিরিয়র রেস্পন্সিবিলিটির প্রশ্ন

১২। বর্তমানে, ধারা ৪(৬) নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে দায়বদ্ধতার ভিত্তিগুলো বিকল্প নির্দেশক (disjunctively) হিসেবে সাজানো হয়েছে- অর্থাৎ **"অথবা"** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেকোনো একটি শর্ত প্রমাণ করাই যথেষ্ট, যার মাঝে একটা হল supervisory negligence.

ধারা ৪(৭) অভিযুক্ত রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে তিনটি শর্ত সংযোজক (conjunctively) হিসেবে পূরণ হতে হবে- অর্থাৎ **"এবং"** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটি শর্ত একসঙ্গে পালন করতে হবে এবং প্রতিটি আলাদা করে প্রমাণ করতে হবে। তাদের জন্য মানদণ্ড স্পষ্টতই উঁচু।

মন্ত্রণালয়ের আপত্তিটি হলো যে ধারা ৪(৬) ও ৪(৭)-এর মানদণ্ড এক করতে হবে। অর্থাৎ নিরাপত্তা বাহিনীর সুপিরিয়র রেস্পন্সিবিলিটির মানদণ্ড বাড়িয়ে, অভিযুক্ত রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের সুপিরিয়র রেস্পন্সিবিলিটির মানদণ্ডের সাথে এক করতে হবে।

আমি এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। এই দুটি ধারার পার্থক্য আকস্মিক নয়। এটি ইচ্ছাকৃত, নীতিগত এবং বাংলাদেশের গত ১৫ বছরের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি। এবং Rome Statute of the International Criminal Court (রোম স্টেচুট) এবং International Crimes Tribunal (ICT) আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৩। **প্রথম যে কারণে অভিযুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তির জন্য মানদণ্ড নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারের থেকে উঁচু রাখা উচিৎ তা হল নীতিগত।** বর্তমান আইন বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা দেয়। এই সুরক্ষা থাকা উচিত। একজন নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার, যিনি অধস্তনদের আদেশ দিতে পারেন, সেই আদেশ প্রত্যাহার করতে পারেন, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন, বরখাস্ত করতে পারেন — তাঁকে দূর-থেকে-নীতি-নির্ধারণ-করা একজন মন্ত্রীর মতো একই মানদণ্ডে কেন বিচার করা হবে? মন্ত্রীতো দৈনন্দিন কন্ট্রোল করে না, কমান্ডার করে। সব গুম রাজনৈতিক নির্দেশে হয় ব্যাপারটা এমনও না, বিশেষ করে সামনে তো আরও হবে না আমরা আশা করি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাহিনীগুলোর ব্যাড অপারেশনাল প্রাকটিসের কারণে অনুনোমদিত গুম হয়। সুপিরিয়র রেস্পন্সিবিলিটির ধারা ঠিক থাকলে এগুলো থামানো সম্ভব।

১৪। **দ্বিতীয় যে কারণে কমান্ডারের জন্য মানদণ্ড রাজনৈতিক ব্যক্তির থেকে শিথিল রাখা উচিৎ তা হল প্র্যাক্টিকাল।** বাংলাদেশে গুমের নির্দেশ মৌখিকভাবে হয়। কমান্ডারদের জন্য মন্ত্রী-লেভেলের উঁচু মানদণ্ড দাবি করলে কার্যত কাউকেই দায়ী করা সম্ভব হবে না।

১৫। **বাহিনীগুলোর নিজেদের স্বার্থেই কমান্ড রেস্পন্সিবিলিটির কাঠামো ঠিক রাখা উচিৎ।** কমান্ড রেস্পন্সিবিলিটির কাঠামো দুর্বল করলে বাহিনীর শৃঙ্খলা দুর্বল হয়, শক্তিশালী নয়। কারণ একজন জুনিয়র অফিসার যখন আটকের আদেশ পালন করেন, তখন তিনি জানেন না তার কমান্ডার ২৪ ঘণ্টা পরে বন্দীকে বৈধভাবে produce করবে নাকি গোপন করবে। ঊর্ধ্বতনের জবাবদিহি না থাকলে আইনি ঝুঁকি পুরোটা জুনিয়রের ওপর পড়ে। আদেশ মানলে

তার একা ঝুঁকি, না মানলে অবাধ্যতার দায়। যাই করুক, বিপদ অবধারিত। সঠিক কমান্ড দায়িত্বের কাঠামো নিশ্চিত করে যে যার সিদ্ধান্ত, তারই দায়।

১৬। **সরকার হয়তো আশঙ্কা করছে অভিযোগে নাম থাকলেই কেউ দায়ী হয়ে যাবে - এটা ভুল।** অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদনে সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া গেলে, অভিযুক্তকে প্রাথমিক পর্যায়েই কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় (ধারা ৯(২))।

১৭। **তবে তদন্তের শুরুতেই অন্তর্ভুক্ত না করার ঝুঁকি কী?** গুম এমন অপরাধ যেখানে শুরুতে সব সাক্ষ্য থাকে না। যেমন নারায়ণগঞ্জ সাত খুন মামলায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারিক সাইদ সাজা পেয়েছেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে মৌখিক নির্দেশ এসেছিল তৎকালীন ADG অপারেশনস কর্নেল জিয়াউল আহসানের কাছ থেকে। এই জিয়াউল আহসানই আমাদের ভাই ইলিয়াস আলীর গুমের সময়েও ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স পদে ছিল। তিনি এডিজি অপারেশনস থাকাকালীন সময়ে বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকেও গুম করা হয়েছিল। যদি ২০১৪ সালে তদন্তটি ওপর পর্যন্ত যেতে পারত, জিয়াউল আহসানকে সেই সময়েই থামানো যেত। ২০২৪-এর অন্তত দশ বছর আগে। কিন্তু আইন সেটা করতে দেয়নি। দায়বদ্ধতা চেইনের নিচেই থেমে গেছে।

১৮। এই প্যাটার্নটি চেনার জন্য মামলাগুলো পুনরায় বিচার করতে হবে না। **শুধু স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশে ঊর্ধ্বতন দায়বদ্ধতার পথ বন্ধ থাকলে যা হয়েছে তা হলো- নিচের স্তরের কর্মকর্তারা শাস্তি পেয়েছেন, আর ওপরের স্তর অক্ষত থেকে একই অপরাধ চালিয়ে গেছে।** এই আইন থেকে সেই সুযোগ বন্ধ করা হচ্ছে। এটি দুর্বল করলে সেই সুযোগ আবার খুলে যাবে। তাই গুম বা সমমানের বা এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে supervisory negligence এবং disjunctive clause থাকতে হবে।

কমিটির কাছে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে এটুকু

১৯। পাঁচটি আপত্তির মধ্যে দুটি যুক্তিসংগত। এই দুটি মেনে নেওয়া উচিত এবং সে অনুযায়ী সংশোধন করা উচিত।

২০। তিনটি মানা উচিত নয়। এই তিনটি পরিবর্তন আইনকে আরও কার্যকর করবে না। উল্টো নতুন আইনি পোশাকে সেই পুরনো কাঠামোই ফিরিয়ে আনবে- যেখানে জবাবদিহি কেবল চেইনের নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, যেখানে আদেশদাতারা তদন্তের বাইরে থাকেন, এবং যেখানে কোনো স্বাধীন সংস্থা অনুমতি ছাড়া কাজ করতে পারে না।

২১। এই কমিটির সামনে সুযোগ আছে এমন একটি আইন পাস করার যেটা সত্যিকার অর্থে অর্থবহ হয়। আমি অনুরোধ করব সেই সুযোগটি যেন নেওয়া হয়।

সম্পূরক নোট: সার্বিক দৃষ্টিতে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ: দায়বদ্ধতা স্বয়ংক্রিয় নয়

মূল বার্তা

২২। গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বের বিধান কি শুধুমাত্র পদে থাকার কারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ফৌজদারি দায়ে দায়ী করে? না। মন্ত্রীসহ বেসামরিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধারা ৪(৭) শুধুমাত্র পদমর্যাদার ভিত্তিতে দায় আরোপ করে না। এটি তিনটি সুনির্দিষ্ট শর্তের একসঙ্গে পূরণ দাবি করে এবং প্রতিটি শর্ত আলাদাভাবে প্রমাণ করতে হয়। গুমের পরিকল্পনায় জড়িত নন এমন একজন মন্ত্রী স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বিধানের আওতায় পড়েন না।

২৩। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকলেও কি তাকে কার্যধারায় রাখা যায়? না। ধারা ৯ একটি প্রাথমিক অব্যাহতির ব্যবস্থা দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদনে কোনো ঊর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া গেলে, অন্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলতে থাকলেও, সেই ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়েই কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। অধ্যাদেশটি শুধুমাত্র ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের আইনের নাগালে পৌঁছানোর জন্য তৈরি — এর বেশি নয়।

রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে আইন আসলে কী দাবি করে

২৪। অধ্যাদেশের ধারা ৪(৭) বেসামরিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ যারা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নন কিন্তু তাদের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন। মন্ত্রীরা নীতিগতভাবে এই শ্রেণির মধ্যে পড়তে পারেন। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক পদে থাকা যথেষ্ট নয়। তিনটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ হলে তবেই দায় উদ্ভব হয়। পূর্ণ বিধানটি নিম্নরূপ:

> *শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নয় এমন কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি যদি উপ-ধারা (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত যেকোনো অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত — (ক) এমন কোনো তথ্য জানেন, অথবা সচেতনভাবে উপেক্ষা করেন যাহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, তাহার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধস্তন কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিতেছেন বা সংঘটন করিতে যাইতেছেন; (খ) উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন কিংবা উক্ত অপরাধ সংঘটনের সহিত জড়িত কোনো পরিকল্পনায় যুক্ত থাকেন; এবং (গ) উক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা দমনে অথবা তদন্ত ও বিচারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য তাহার কর্তৃত্বাধীন সকল ধরনের প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন বা বিরত থাকেন — সেইক্ষেত্রে উক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিও মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।* Section 4(7)

২৫। তিনটি শর্ত একসঙ্গে থাকতে হবে।

প্রথম শর্ত — জ্ঞান বা সচেতন উপেক্ষা (ক): মন্ত্রীকে জানতে হবে, অথবা সচেতনভাবে উপেক্ষা করতে হবে — এমন স্পষ্ট তথ্য যা নির্দেশ করে যে তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীন কেউ গুমের অপরাধ করছে বা করতে যাচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা বা সাধারণ অসতর্কতা যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় শর্ত — কার্যগত সংযোগ (খ): মন্ত্রীকে অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপে দায়িত্ব পালন বা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে হবে, অথবা সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় যুক্ত থাকতে হবে। একটি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক নীতিগত তদারকি এবং গুম সংঘটনের নির্দিষ্ট কার্যক্রমে কর্তৃত্ব প্রয়োগ — এই দুটো এক জিনিস নয়।

তৃতীয় শর্ত — ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা (গ): মন্ত্রীকে তার কর্তৃত্বের আওতায় থাকা সকল ধরনের প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হতে হবে — অপরাধ প্রতিরোধ, দমন বা তদন্ত ও বিচারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের ক্ষেত্রে।

তিনটি শর্তই একসঙ্গে থাকতে হবে। বিধানটি (খ) ও (গ) শর্তকে "এবং" শব্দ দিয়ে যুক্ত করেছে — এটি সংযোজনমূলক। কোনো একটি শর্ত না থাকলে ধারা ৪(৭) প্রযোজ্য হয় না।

Table 1: কোন বিধান কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

ধারা ৪(৬): নিরাপত্তা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন	ধারা ৪(৭): বেসামরিক ঊর্ধ্বতন
নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, কমান্ডার ও দলনেতা — সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ড এবং যেকোনো যৌথ বা বিশেষ বাহিনী (ধারা ২(ঠ) দ্রষ্টব্য)	যারা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নন কিন্তু তাদের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন — মন্ত্রী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাসহ

বাস্তবে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ

২৬। ধারা ৪(৭)-এর ব্যাখ্যামূলক টীকায় "কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ"-এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে:

> *অধস্তনদের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা এবং এই ধরনের আদেশ পালনের নিশ্চয়তা বিধানের সক্ষমতা।*
>
> Explanation to Section 4(7)

এটি একটি কার্যপরিচালনামূলক মানদণ্ড। একজন মন্ত্রী যিনি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক নীতিনির্ধারণ করেন, তিনি শুধু সেই কারণে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নির্দেশ দেওয়ার এবং সেই নির্দেশ পালন নিশ্চিত করার ক্ষমতা অর্জন করেন না। দুটো কাঠামোগতভাবে আলাদা। মন্ত্রীরা নীতি নির্ধারণ করেন। কার্যপরিচালনার আদেশ দেন কমান্ডাররা। ধারা ৪(৭) দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কথা বলে, প্রথমটি নিয়ে নয়।

২৭। তৃতীয় শর্তটিও বাস্তবিক । যে মন্ত্রী কোনো অনিয়মের অভিযোগ বা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পেয়ে তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান, তদন্তের আদেশ দেন বা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন — তিনি সাধারণত এই বিধান যা দাবি করে তা-ই করছেন। ধারা ৪(৭) কোনো মন্ত্রীকে শুধু তার তত্ত্বাবধানাধীন সংস্থার সম্ভাব্য অনিয়ম সম্পর্কে জানার কারণে শাস্তি দেয় না। এটি প্রযোজ্য হয় যেখানে একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কার্যগত সংযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন বা বিরত থাকেন।

২৮। কোনো মন্ত্রীর কাছে সম্ভাব্য গুমের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পৌঁছালে তা দ্রুত ও আনুষ্ঠানিকভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে এবং সেই পাঠানোর বিষয়টি নথিবদ্ধ করতে হবে। এটি সাধারণত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে মন্ত্রী ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হননি।

ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগোয় না

২৯। সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকলেও কি কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যধারায় টানা যায়? অধ্যাদেশের ধারা ৯ এই উদ্বেগটি সরাসরি মোকাবেলা করেছে। যেখানে কোনো অভিযোগে উল্লেখ থাকে যে কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ধারা ৪(৬)(গ) বা (ঘ)-এর অধীন অপরাধ করেছেন, সেখানে ধারা ৯(১) কমিশনকে উপযুক্ত মনে করলে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মূল তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই শুধুমাত্র সেই বিষয়ে একটি পৃথক অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ দেয়:

> *ধারা ৮ এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো অভিযোগে উল্লেখ থাকে যে, কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৬) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে কমিশন, উপযুক্ত মনে করিলে, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে শুধুমাত্র উক্ত বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারিবেন; তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর বা বাহিনীর আদেশ-কাঠামোর (command structure) সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিবেন।* Section 9(1)

৩০। সেই অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া গেলে, ধারা ৯(২) অন্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত থাকলেও প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যধারা থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা দেয়:

> *যেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নাই, সেইক্ষেত্রে কমিশন, তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ট্রাইবুনালের নিকট প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং এই ধরনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, ট্রাইবুনাল সন্তুষ্ট হইলে, অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও, উক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিকে কার্যধারা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ দিতে পারিবে।* Section 9(2)

৩১। ধারা ৯(৩) একটি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা যুক্ত করেছে যাতে এই ব্যবস্থাটি প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে ব্যবহার না হয়। সম্পূর্ণ তদন্তে পরবর্তীতে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সেই ব্যক্তির নাম যুক্ত করতে পারবেন:

> *উপ-ধারা (২) এর অধীন ঊর্ধ্বতন কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া সত্ত্বেও, যদি তদন্ত শেষে পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনে জড়িত, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার প্রতিবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।* Section 9(3)

৩২। ধারা ৯(১), ৯(২) ও ৯(৩) মিলিয়ে একটি ধাপে ধাপে এগোনো প্রক্রিয়া তৈরি হয়: অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি, ঊর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণের অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন, সাক্ষ্যপ্রমাণ অপ্রতুল হলে প্রাথমিক অব্যাহতি, এবং সম্পূর্ণ তদন্তে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেলেই কেবল পুনরায় অন্তর্ভুক্তি। সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্বিশেষে কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যধারায় জড়ানো হবে — এই উদ্বেগটি এই আইনি কাঠামো দ্বারা সরাসরি খণ্ডিত।

নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের তুলনায় নিরাপত্তা বাহিনীর বাইরের ঊর্ধ্বতনদের জন্য আইনে উঁচু মানদণ্ড

৩৩। ধারা ৪(৬) ও ৪(৭)-এর পার্থক্য ইচ্ছাকৃত এবং নীতিগত। ধারা ৪(৬) নিরাপত্তা বাহিনীর ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে দায়ের ভিত্তিগুলো "অথবা" শব্দে বিকল্পভাবে সাজানো — যেকোনো একটি ভিত্তি যথেষ্ট হতে পারে। ধারা ৪(৭), বিপরীতে, বেসামরিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে "এবং" শব্দে সংযোজনমূলকভাবে প্রণীত — তিনটি শর্ত একসঙ্গে প্রমাণ করতে হবে।

এর পাশাপাশি ধারা ৪(৬)-এ একটি অনুমান বিধানও আছে:

> *ভিন্নরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণের অবর্তমানে আদালত অনুমান করিতে পারিবে যে, শৃঙ্খলা-বাহিনীর অধস্তনের ওপর ঊর্ধ্বতনের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল।* Section 4(6)

ধারা ৪(৭)-এ এরকম কোনো অনুমান নেই। রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ইতিবাচকভাবে প্রমাণ করতে হবে।

অতএব রাজনৈতিক ঊর্ধ্বতনদের দায়ের জন্য মানদণ্ড স্পষ্টতই উঁচু।

নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের জন্য বৃহত্তর দায় কেন যুক্তিসংগত

৩৪। ধারা ৪(৬)-এর বিস্তৃত পরিসর যুক্তিহীন নয়। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব দলিলায়িত গুমের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। কমান্ড কর্তৃত্বের সঙ্গে কমান্ড দায়িত্ব আসে। একজন নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার অধস্তনদের ওপর আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলামূলক ক্ষমতা রাখেন। তিনি আদেশ দিতে পারেন, সেই আদেশ প্রত্যাহার করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, বরখাস্ত করতে পারেন। এটাই চেইন অব কমান্ডকে কার্যকর রাখে। ধারা ৪(৬)-এর বিস্তৃত পরিসর আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও রোম স্টেচুটে ইতিমধ্যে প্রোথিত একটি নীতির আইনি প্রকাশ: যারা অন্যায় প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখেন, তারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্বও বহন করেন।

৩৫। বাংলাদেশে গুমের ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো অফিসারের কাজ ছিল না। এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে — আটকের জায়গা, লগবুকে ইচ্ছাকৃত বাদ, ইউনিটের ভেতরে নীরবতা। এই ধরনের সংগঠিত আচরণে চেইনের ওপরের স্তরের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সম্মতি লাগে। যে কমান্ডার রেকর্ড পরীক্ষা করেন না, অধস্তনদের প্রশ্ন করেন না, অনুমোদিত কার্যক্রমের বাইরে অপারেশন হচ্ছে কিনা সেটা দেখেন না — তিনি ফলাফলের দায় থেকে মুক্ত নন। ধারা ৪(৬)(গ)-তে তত্ত্বাবধানীয় অবহেলাকে স্বতন্ত্র ভিত্তি হিসেবে রাখা এটি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।

৩৬। **কমান্ড জবাবদিহি না থাকলে "যাই করি বিপদে পড়ি" সমস্যা।** এখানে আরও একটি যুক্তি আছে যা সরাসরি নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরকার শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কাউকে আটক করার আদেশ পালন করা একজন জুনিয়র অফিসার শুরুতে জানেন না যে আটকটি বৈধ থাকবে নাকি পরে গুমে পরিণত হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধারা ৪(১)-এর অধীনে গুমের অপরাধ আটকের মুহূর্তে সম্পূর্ণ হয় না। এটি সম্পূর্ণ হয় যখন একজন ব্যক্তিকে আইনের সুরক্ষার বাইরে রাখা হয় — তার আটকের কথা অস্বীকার করা হয়, অবস্থান গোপন করা হয় — ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার বৈধ সময়সীমা পার হওয়ার

পর। আটকের আদেশ পালন করা জুনিয়র অফিসার সেই মুহূর্তে জানেন না যে ঊর্ধ্বতন আটকটি বৈধভাবে স্বীকার করবেন নাকি গোপন করবেন।

৩৭। এরপর যদি আইনটি এই বার্তা দেয় যে আদেশ দেওয়া ঊর্ধ্বতন কখনো জবাবদিহির মুখোমুখি হবেন না — তাহলে ওই জুনিয়র অফিসার অসম্ভব পরিস্থিতিতে পড়েন। আদেশ মানলে আইনি ঝুঁকি তার একার। না মানলে অবাধ্যতার দায়। যাই করুন, বিপদ অবধারিত।

৩৮। এই পরিস্থিতি নিরাপত্তা বাহিনীর সমূহের শৃঙ্খলা শক্তিশালী করে না। এর ফল বিপরীত হবে। বর্তমান আইনে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা প্রতিটি অধস্তনকে বুঝতে দেয় যে, ঝুঁকি নিচে নামে, সুরক্ষা ওপরে থাকে এবং প্রতিটি আদেশ সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। ধারা ৪(৬)-এ মূর্ত সঠিক কমান্ড দায়িত্বের কাঠামো এটি সমাধান করে — কর্তৃত্ব ও জবাবদিহি একসঙ্গে চলে। যে কমান্ডার আদেশ দেন, ফলাফল বেআইনি হলে পরিণতি তারও। এই প্রণোদনা কাঠামোই চেইনের প্রতিটি স্তরে সতর্ক আদেশ, প্রকৃত তত্ত্বাবধান ও বৈধ আচরণকে উৎসাহিত করে।

এই বিধান দুর্বল করলে সরকারের ঝুঁকি বাড়বে

৩৯। ঊর্ধ্বতন দায়িত্ব বাদ দেওয়া বা দুর্বল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারের স্বার্থে তা না করাই সমীচীন।

- ধারা ৪(৭) বহাল থাকলে, যে মন্ত্রী তথ্য পেয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছেন তার হাতে একটি স্পষ্ট আইনি মানদণ্ড থাকে। আইন নিজেই নিশ্চিত করে যে তিনি যা করার ছিল তা করেছেন। এই মানদণ্ড তুলে দিলে মন্ত্রীদের সুরক্ষা হয় না। বরং সেই কাঠামোটিই নষ্ট হয় যা তাদের নিজের আচরণ বৈধ ছিল বলে প্রমাণ করতে সহায়তা করত।
- ধারা ৪(৬) দুর্বল করলে নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরে একটি গুরুতর সমস্যা তৈরি হবে। অপারেশন পরিচালনাকারীদের ওপর দায়িত্ব অর্থবহভাবে আরোপিত না হলে, আইনগত ও বাস্তব ঝুঁকি মূলত জুনিয়র অফিসারদের ওপরই পড়তে থাকবে, আর চেইনের ওপরের স্তর অক্ষত থাকবে। এটি বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে দেবে।
- দুর্বল কমান্ড দায়িত্বের কাঠামো আগে যে কাঠামোগত পরিস্থিতিতে দায়মুক্তি টিকে ছিল, সেই একই অবস্থা পুনরায় তৈরির ঝুঁকি তৈরি করে। এটি সরকারের ঘোষিত অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।